সমরেশ বসুর ছোটগল্পে রূপোপজীবিনী

মীর হুমায়ূন কবীর*

[সারসংক্ষেপ : বাংলা ছোটগল্পে সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮) এক অনন্য কথাশিল্পী। চল্লিশের দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫), মহামারি-মন্বন্তর (১৯৪৩), সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯৪৬) এবং দেশভাগের (১৯৪৭) পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনে যে রূপ-রূপান্তর সাধিত হয়, সমরেশ বসুর গল্পে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই কালপর্বে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক জটিল হয়ে ওঠে, ভেঙে পড়ে পরিবার-সমাজের চিরায়ত বন্ধন; ক্ষমতাবানদের দাপটে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে সাধারণ জনজীবন। প্রতিকূল সমাজব্যবস্থায় মুখ থুবড়ে পড়ে নরনারীর প্রেম ও দাম্পত্যজীবন। অভাব-অনটনের কাছে মূল্যবোধ হারিয়ে কিংবা উন্নত জীবনের মোহে অনেক নারী বেছে নেয় নিষিদ্ধ-পল্লির অন্ধকার-জীবন। বেঁচে থাকবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় তারা জলাঞ্জলি দেয় দীর্ঘদিনের লালিত ধর্ম, সংস্কার ও মানবিক ঔচিত্যবোধ। এসব রূপোপজীবিনীর দুঃসহ মর্মবেদনা সমরেশ বসুর গল্পে বিশ্বস্তভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে সমরেশ বসুর ছোটগল্পে চিত্রিত রূপোপজীবিনীদের জীবনসংকটের নানা প্রসঙ্গ পর্যালোচনার প্রয়াস গৃহীত হয়েছে।]

আবহমানকাল থেকে সমাজ-পরিসরে রূপোপজীবিনীদের অস্তিত্ব ছিল। ভারতবর্ষের পুরাণ, মহাকাব্য এবং লোকসাহিত্যেও তাদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি রয়েছে। প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে ভারতে রূপোপজীবিনীদের সামাজিক অবস্থান নির্ণীত হয়েছে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে। সেসময় তারা ছিল রাজ্য-নিয়ন্ত্রিত; তাদের সার্বিক দেখভালের জন্য প্রশাসকরূপে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন একজন গণিকাধ্যক্ষ। রূপোপজীবিনী এবং গ্রাহকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নানা আইনও প্রচলিত ছিল, নির্ধারিত ছিল তাদের বেতন ও কর্মকাঠামো।[১]

ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে রূপোপজীবিনীদের সমাজ-স্বাধীনতা থাকলেও পরবর্তীকালে "ধর্ম ও লোকাচারের হাত ধরে প্রায় সকল সমাজে গণিকাদের সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে, একবার গণিকাবৃত্তি করলে কোনো নারী চিরতরে সামাজিক মর্যাদা হারায় এবং সমাজের চোখে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব বলে গণ্য হতে থাকে" (মনিরুল, ২০২০ : ১৬৭)। *চর্যাপদের* বর্ণনায় তাই দেহোপজীবিনী সম্প্রদায়কে সামাজিকভাবে মূল্যহীন দেখা যায়। কামনার সময় ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে তারা ডোম, চণ্ডালদের মতোই অস্পৃশ্য ছিল। ১০-সংখ্যক চর্যায় বলা হয়েছে : "নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহারি কুড়িআ।/ ছোই ছোই জাসি বাম্হণ নাড়িআ ॥" (হাই ও পাশা, ১৪১৪ : ৮৫)

মধ্যযুগে নবাব-বাদশাদের হারেমে রূপোপজীবিনীরা অনেকটা দাসীর মতো বিবেচিত হতো; কেউ-কেউ বাইজিরূপে নাচ-গান পরিবেশন করতো। তবে "রাজাদের বিলাস-ব্যসনের জন্যেই শুধু নয়, সৈন্যদের স্বাভাবিক শরীরী বাসনা মেটানোর জন্যেও বারনারীর প্রয়োজন পড়তো" (মাসুদ, ২০১৩ : ৪৭)। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজ সৈন্যরা অতিমাত্রায় পতিতা-সংসর্গ স্থাপন করে। এর ফলে তারা মারাত্মক স্বাস্থ্য-ঝুঁকিতে পড়ে। সৈনিকদের সুরক্ষার

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রয়োজনে তখন দেহ-ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং প্রবর্তিত হয় 'ক্যান্টনমেন্ট অ্যাক্ট' (১৮৬৪)। এ আইনের পর "সেনা-ছাউনিগুলোতে ইংরেজ সৈন্যদের জন্য তৈরি হল আলাদা বেশ্যালয়" (মৌ, ২০১৯ : ৬)। এতৎসত্ত্বেও পরিস্থিতি অপরিবর্তিত থাকলে পাশ হয় 'কন্টাজিয়াস ডিজিসেস অ্যাক্ট' (১৮৬৮)। এই আইনের ফলে রূপোপজীবিনীদের নাম নথিভুক্ত করা হয় এবং তাদের নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। তাদের শরীরে রোগের অস্তিত্ব প্রমাণিত হলে অন্তত ছয় মাস হাসপাতালে বন্দি রাখা হয়। এভাবে "সরকার তার সৈন্যদের যৌনক্ষুধা নিবৃত্তির বিষয়টি যেমন ইতিবাচকভাবে দেখেছে, তেমনি নৈতিক হলেও নিষ্ঠুরতাকে উপেক্ষা করতে তারা পারেনি। তারা নিয়ন্ত্রণের নামে যৌন ব্যবসার বাজার প্রসারকে সংকুচিত করতে ব্যর্থ হয়েছে।" (কবীর, ২০১৩ : ১৯)

উনিশ শতকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি অংশ 'বাবু-সংস্কৃতি'র নামে উপপত্নী পালন করে। এদের ধারণা "বারাঙ্গনা বা রক্ষিতা না থাকলে বাবু হওয়া যায় না" (বিলকিস, ২০১৩ : ১৫৬)। এজন্য ঘরে স্ত্রী থাকলেও তারা বাগানবাড়িতে পতিতাসঙ্গ উপভোগ করতো। তৎকালীন পত্র-পত্রিকা এবং আত্মচরিতে এ-প্রসঙ্গে নানা বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।[২] 'বাবু' শ্রেণির অনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিচয় পাওয়া যায় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৭৮৭-১৮৪৮) *নববাবু বিলাস* (১৮২৬) শীর্ষক ব্যঙ্গরচনা, মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) *একেই কি বলে সভ্যতা?* (১৮৬০) এবং দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-১৮৭৩) *সধবার একাদশী* (১৮৬৬) নাটকে। মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯১১) *এর উপায় কি?* (১৮৭৫) প্রহসনেও একই সংকট প্রদর্শিত হয়েছে। উনিশ শতকের বাংলায় কিছু রূপোপজীবিনীর পরিচয় পাওয়া যায়, যারা সঙ্গীত, নৃত্য এবং অভিনয়ে পারদর্শী ছিল।[৩] এই পরিপ্রেক্ষিতে "মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রস্তাব দেন, নাটকে স্ত্রী চরিত্রগুলিতে পুরুষরা অভিনয় না করে, অভিনয় করুক বারাঙ্গনরা। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অক্ষয় কুমার মজুমদার, বটুবাবু, দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, হরিদাস দাস, প্রিয়নাথ বসু প্রভৃতি সে সময়ের বিখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্বরা এই প্রস্তাব মেনে নিলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অবশ্য এতে আপত্তি জানিয়ে বেঙ্গল থিয়েটার কমিটি থেকে সরে এসেছিলেন। কিন্তু ১৮৭৩ সালে বেঙ্গল থিয়েটারে মধুসূদনের নাটক *শর্মিষ্ঠা* অভিনীত হল বারাঙ্গনাদের নিয়ে।" (মণি ও স্বাতী, ২০২০ : ২৫)

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সংঘটিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৭) ভয়াবহতা বৈশ্বিকভাবে মানুষকে বিপন্ন করে তোলে। ভারতবর্ষ সংঘাতের বাইরে থাকলেও, ব্রিটিশ উপনিবেশ-শাসিত এ অঞ্চলে যুদ্ধের নানা পরোক্ষ প্রভাব অনিবার্য হয়ে ওঠে। যুদ্ধকালে এবং তৎপরবর্তী সময়ে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দুর্মূল্য এবং কর্মসংস্থানের অভাবে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে। এসময় ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের কাছে পরাজিত হয়ে অনেক নারী অনিচ্ছাসত্ত্বেও দেহবিক্রয় করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে (১৯৩৯-১৯৪৫) মিত্রবাহিনীর একাংশ মনোরঞ্জনের জন্য বেছে নেয় এদেশীয় নারীদের :

> চট্টগ্রাম, ঢাকা, কুমিল্লা সর্বত্র – যেখানে ব্রিটিশ আর্মি – সেখানেই ত্রাস। লোকের চোখে তারা মূর্তিমান বিভীষিকা। যে অত্যাচার তারা লোকের উপর করেছে! সে সময় ব্রিটিশ সরকার আফ্রিকা থেকে এমন এক জাতের সৈন্য আমদানি করেছিল – যারা একেবারে বর্বর। ধরুন কুমিল্লায় – গোটা শহরে পাঁচ সাত ঘরের বেশি মেয়ে নেই। সবাই শহর ছেড়ে চলে গেছে। মেয়ের খোঁজে ওই আফ্রিকান সৈন্যরা গোটা শহর চষে বেড়াচ্ছে। তারা শুধু একটা কথা জানে – বিবি! বিবি আর বিবি! (অমলেন্দু, ২০০৬ : ১৯)

এ-সুযোগে স্বার্থান্বেষী এক শ্রেণি সেনাক্যাম্পে নারী সরবরাহ শুরু করে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে (১৩৫০) এ-সংকট আরো ঘনীভূত হয়ে ওঠে। মড়কতাড়িত গ্রামবাংলার গৃহলক্ষ্মীদের প্রলুব্ধ করে নারীপাচারকারীরা তাদের বিক্রয় করে কলকাতার পতিতা-পল্লিতে। দেশভাগের পর এসব

ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে এবং গণিকাবৃত্তি একটি সামাজিক ব্যাধিরূপে ছড়িয়ে পড়ে। উদ্বাস্তু নারীরা তখন সামান্য প্রলোভনে পাচারকারীদের করায়ত্তে আসে এবং নিষিদ্ধ-পল্লিতে দিনযাপন করে। সমরেশ বসুর ছোটগল্পের রূপোপজীবিনী চরিত্রগুলো এসময়েরই আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক বাস্তবতার শিকার।

দুই

বাংলা ছোটগল্পে রূপোপজীবিনীদের নিয়ে প্রথম গল্প লেখেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। 'বিচারক' গল্পে তিনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কাছে পরাজিত এক নারীর পতিতা হয়ে ওঠার কাহিনি পরিবেশন করেছেন। বারবনিতারা অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে স্থান পেয়েছে শরৎ-সাহিত্যে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) 'আঁধারে আলো' গল্পে বিজলী নামের এক রূপোপজীবিনীর আত্মসম্মানবোধের দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছে। যদিও গল্পের তুলনায় তাঁর উপন্যাসে এই অন্ধকার-জীবন নানামাত্রিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে *শ্রীকান্ত* (১৯১৭) উপন্যাসের রাজলক্ষ্মী, *দেবদাসের* (১৯১৭) চন্দ্রমুখী, *শুভদা* (১৯১৮) উপন্যাসের কাত্যায়নী প্রমুখ চরিত্র স্মরণীয়।

শরৎচন্দ্রের পর রূপোপজীবিনীদের গ্লানিময় জীবন বর্ণিত হয়েছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের (১৯০৪-১৯৮৮) 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', 'সংসার সীমান্তে', 'মহানগর' প্রভৃতি গল্পে। দেহোপজীবিনী নারীর প্রেম-ভালোবাসার গল্প মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৪-১৯৮৮) 'বিষাক্ত প্রেম'; তাঁর 'আজ কাল পরশুর গল্প'তে দেখা যায়, দুর্ভিক্ষ-উত্তরকালে এক বারবধূর সামাজিক বিড়ম্বনার চিত্র। রূপোপজীবিনীর অভিশপ্ত জীবনলিপি প্রদর্শিত হয়েছে সুবোধ ঘোষের (১৯০৯-১৯৮০) 'পরশুরামের কুঠার' গল্পেও। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সমাজব্যবস্থায় রূপোপজীবিনীর দুঃখ-দুর্গতি বাস্তবসম্মতভাবে চিত্রিত হয়েছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯১৮-১৯৭০) 'শুভক্ষণ', 'একজিবিশন', 'উর্বশী', 'কুয়াশা', তিমিরাভিসার' প্রভৃতি গল্পে। তবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রূপোপজীবিনীদের প্রতি সমব্যথী হলেও পারিবারিক জীবনাবর্তে ফিরিয়ে আনেননি। মন্বন্তরকালে গণিকাদের জীবনসংগ্রাম এবং করুণ পরিণতি প্রদর্শিত হয়েছে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের (১৯১৬-১৯৭৫) 'রসাভাস', 'পুনশ্চ', 'রত্নাবাঈ', 'বিদ্যুৎলতা', 'শুভার্থী', 'জামাই', 'সুধা হালদার ও সম্প্রদায়' প্রভৃতি গল্পে। পরবর্তীকালে সমরেশ বসুও দুর্ভিক্ষ-দেশভাগের প্রেক্ষাপটে রূপোপজীবিনীদের মনস্তত্ত্ব, দারিদ্র্য-যন্ত্রণা এবং অন্দরমহলের শূন্যতা অনুপুঙ্খভাবে রূপায়ণ করেছেন। তাঁর এ শ্রেণির গল্পের মধ্যে 'অবক্ষয়', 'শুভ্রা-সন্ধ্যা সংবাদ', 'দেওয়াল লিপি', 'প্রাণ-পিপাসা', 'বিষের ঝাড়', 'পঞ্চায়েত', মেঘলা ভাঙা রোদ', 'মাসের প্রথম রবিবার', 'আলোর বৃত্তে' প্রভৃতি অন্যতম। এই পঙ্কিল জীবনের খণ্ডিত চিত্র রয়েছে তাঁর 'মরশুমের একদিন', 'মানুষ রতন', 'আর একটি মানুষ', 'উৎপাত', 'পাহাড়ী ঢল' প্রভৃতি গল্পেও।

তিন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে রূপোপজীবিনীর দুটি ভিন্নরূপ উন্মোচিত হয়েছে 'অবক্ষয়' গল্পে। এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হরিদয়াল পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকে কাহিনিটি বিবৃত হয়েছে। হরিদয়াল রেলওয়ে বিভাগের একজন কেরানি; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে তার দপ্তর ছিল সেনা-নিয়ন্ত্রিত। সেনাবাহিনীর গাড়ি এবং সামরিক সরঞ্জামাদির ওয়াগনগুলোর হিসাবরক্ষণ এবং রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সর্বক্ষণ যোগাযোগ-স্থাপন ছিল তার কাজ। এই রেলওয়ে ইয়ার্ডে প্রতিদিন বহুজাতিক ফৌজের যাতায়াত ছিল। এদের মধ্যে অধিকাংশই ব্রিটিশ, আমেরিকান এবং অস্ট্রেলিয়ান। মাঝেমধ্যে সেখানে তাদের কয়েকদিন অবস্থান করতে হতো। তবে তারা বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে চাইতো না; দ্রুত ছাড় পেতে হরিদয়ালকে তারা নানা উৎকোচ প্রদান করতো। যেমন : মদের বোতল, সিগারেট, লাইটার, মাছ, সিগারেট, ফলমূল ইত্যাদি। বিরতি-লগ্নে কেউ-কেউ নারীমাংসের জন্য ছটফট করতো। হরিদয়ালকে তারা পতিতা

সরবরাহের জন্য চাপ সৃষ্টি করতো। কিন্তু সে ওদের অন্যায় আবদার সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করতো।

এ গল্পে শোভা নামের এক মেয়েকে হরিদয়াল পছন্দ করে। তার অফিসের সীমানা-প্রাচীরের ওপারেই মেয়েটির বাড়ি। শোভার বাবা পেশায় স্কুলশিক্ষক, যুদ্ধের বাজারে শিক্ষকতা করে তাঁর পরিবার-নির্বাহ ছিল দুঃসাধ্য। তাছাড়া তাঁর ছেলেমেয়ের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। তাই হরিদয়াল-শোভার প্রেমের সম্পর্কে পারিবারিক বাধা ছিল না। আর তখন এ-কথা প্রচলিত ছিল যে, "রেলের লোকেরাই একমাত্র যুদ্ধের সময় তিন বেলা ভাত খেতে পেত" (সমরেশ, ২০১৪ : ২১৫)। হরিদয়ালও শোভাদের আর্থিকভাবে সহযোগিতা করতো। পিতা দরিদ্র হলেও শোভা ছিল অনিন্দ্য সুন্দরী। একদিন তাকে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধতে দেখে কয়েকজন সৈনিক লালসাপ্রবণ হয়ে ওঠে। কামুক সেনাদল শোভার বাড়ির দিকে অগ্রসর হলে হরিদয়াল বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ম্যাক নামের এক সৈনিক তার দিকে রিভালবার তাক করে। প্রেমিকাকে রক্ষা করতে হরিদয়াল অপকৌশলের আশ্রয় নেয়। স্টেশনের এক পতিতাকে সে হিংস্র সৈনিকদের কাছে তুলে দেয়, যদিও ইতঃপূর্বে সে এদের কেবল অবজ্ঞার দৃষ্টিতেই মূল্যায়ন করেছে। দীর্ঘক্ষণ পৈশাচিক নির্যাতনের পর মেয়েটির ওপর বর্ষিত হয় 'নোট বৃষ্টি'। ততক্ষণে ওর দাঁড়ানোর শক্তি অবশিষ্ট নেই। তারপরও মোটা অঙ্কের টাকা দেখে সে নিজেকে সামলে নেয়। তার সহ্যশক্তির উৎস সন্ধানে হরিদয়ালের মনে হয়, "শত হলেও বেশ্যা তো" (সমরেশ, ২০১৪ : ২১৮)! হরিদয়াল মেয়েটির হাত ধরে তাকে শরশয্যা থেকে উঠতে সহায়তা করে। মেয়েটির প্রতি সে একরকম কৃতজ্ঞ, কেননা ওর জায়গায় থাকতে পারতো তারই প্রেমিকা শোভা।

হরিদয়ালের কাছে ঘটনাটি শুনে শোভা শিহরিত হয়। অবশ্য তার চোখেমুখে ছিল প্রেমিকের প্রতি পরম নির্ভরতার ছাপ। কিছুদিন পর শোভার স্বভাব-চরিত্রে ঘটে আমূল পরিবর্তন। দরিদ্র জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সে দামি শাড়ি, গয়না আর টাকার জন্য লালায়িত হয়। ঐশ্বর্য এবং উন্নত জীবনের আকাঙ্ক্ষায় সে হয়ে পড়ে নির্লজ্জ। শহরের লম্পট ধনিক শ্রেণি ক্রমশ হয়ে ওঠে তার বন্ধুপ্রতিম। তার সুখ-সমাদর দেখে প্রতিবেশী মেয়েরা ঈর্ষান্বিত হয়। আরও বিস্ময়কর যে, শিক্ষিত পিতামাতা তাদের উচ্ছন্নে যাওয়া মেয়েকে শাসন নয়, বরং প্রশ্রয় দেয়। এ বিষয়টি হরিদয়ালের মনে নানা প্রশ্নের জন্ম দেয়। স্টেশনের পতিতারা ক্ষুধায় কাতর হয়ে নিজেদের বিলিয়ে দেয়। কিন্তু সংসারে অভাব-অনটন থাকলেও শোভার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি এমন জটিল নয়। হরিদয়াল বুঝতে পারে শোভার চারিত্রিক স্খলন কেবল অর্থের জন্য নয়। যুদ্ধোত্তর সমাজব্যবস্থায় সার্বিক অবক্ষয়ের প্রভাবে সে রূপোপজীবিনী হয়ে উঠেছে। গল্পকথককে হরিদয়াল বলেছে—

> কিন্তু জানবেন, আসল জায়গায় পচন ধরেছে। উঁচু থেকে নিচুতলা পর্যন্ত লোভ, লালসা আর বাসনা, কোটি কোটি আত্মাকে ফুটো করে দিয়েছে। সমস্ত মানুষের বৈষয়িক উন্নতি করতে চান, করুন। কিন্তু দোহাই, আপনারা নাকি মানবাত্মার কারিগর, আত্মাগুলোকে মেরামত করুন, শুদ্ধ করুন। নইলে গোটা পৃথিবীটা সোনা দিয়ে মুড়ে দিলেও আত্মার দারিদ্র্য ঘোচাতে পারবেন না। (সমরেশ, ২০১৪ : ২১৯-২২০)

অবক্ষয়ের বিষবাষ্প থেকে হরিদয়ালও শেষপর্যন্ত পরিত্রাণ পায়নি। রেলের কেরানি হিসেবে তার বেতন ছিল সাকুল্যে দেড়শো টাকা। স্বল্প বেতন এবং সততার মূল্যায়ন না পেয়ে সে নিজেও জড়িয়ে পড়ে অপকর্মে। গল্পে চাকরির পাশাপাশি তাকে দালালি করতে দেখা যায়। রেলের ওয়াগন ভেঙে যারা মালপত্র কেনাবেচা করে, তাদের মধ্যে সে মধ্যস্থতা করে। এ কাজে তার মাসিক উপার্জন দেড় থেকে দুই হাজার টাকা। 'অবক্ষয়' গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহ

থাকলেও তা কাহিনিকে নিয়ন্ত্রণ করেনি। বরং বিশ্বযুদ্ধোত্তর অবক্ষয়দীর্ণ সমাজব্যবস্থার কাছে মানুষের অসহায় আত্মসমর্পণের গল্প শুনিয়েছেন সমরেশ বসু।

শোভার মতোই আত্মকেন্দ্রিক নারীচরিত্র 'শুভ্রা-সন্ধ্যা সংবাদ' গল্পের সন্ধ্যা। পরিবারে আহার-আশ্রয়ের বন্দোবস্ত থাকলেও সে নারীধর্ম রক্ষা করতে পারেনি। যদিও একইরকম পারিবারিক কাঠামোতে বেড়ে ওঠা আরেকটি মেয়ে শুভ্রা শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও চারিত্রিক বিশুদ্ধতা বিসর্জন দেয়নি। এ গল্পে শুভ্রার পিতা চটকলের কেরানি। স্বল্প বেতনে তার সংসার-পরিচালনা অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। সহকর্মীরা যখন অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে বাড়তি উপার্জনে ব্যস্ত, তখনও তিনি পঙ্কিল স্রোতে গা ভাসাননি। তার উন্নতির একমাত্র সোপান বাৎসরিক দশ টাকার ইনক্রিমেন্ট। অর্থকষ্টে কলেজের সম্ভাবনাময়ী ছাত্রী শুভ্রা কোনোরকম বি.এ. পাশ করলেও তার ভাই দুটি লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়ে। অনিশ্চিত জীবনপরিবেশে তারা কুসঙ্গে সময় অতিবাহিত করে। পরিবারের দুরবস্থার জন্য শুভ্রা পিতাকে নয়, দায়ী করে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে। তার বিশ্লেষণ ছিল এরকম :

> বাবাকে সে-জন্য কখনোই দোষ দিতে পারি না। দোষ যদি দিতেই হয়, তবে দোষের বদলে অভিশাপই দেব এই বর্তমান সমাজ আর রাষ্ট্রব্যবস্থাকে। ধিক্কার দেব আমাদের সরকারি অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলোকে। এইসব ব্যবস্থাই গরিবকে আরো গরিব করেছে, বড়লোকদের ভাণ্ডার আরো বেশি ভরে তুলেছে। আমাদের এ দেশটা স্বাধীন হবার আগে কেমন ছিল, জানি না। কারণ আমার জন্ম স্বাধীনতার পরে। জন্মের পর আস্তে আস্তে যতই জ্ঞান বাড়তে লাগল, ততই বুঝতে পারলাম, দেশের গোটা ব্যবস্থা আর পরিকল্পনার মধ্যে কোটি কোটি মানুষের অসহায় অপমান ছাড়া আর কিছু নেই। (সমরেশ, ২০১৪ : ৪৮৯)

সাংসারিক অস্বচ্ছলতার দরুন শুভ্রা কয়েকটি টিউশনি করে। এছাড়া চাকরির বাজারে নিজেকে উপযোগী করতে সে টাইপরাইটিং, শর্টহ্যান্ড এবং টেলিফোন অপারেটরের কাজ শিখতে শুরু করে। এত যোগ্যতা সত্ত্বেও সে চাকরিলাভে ব্যর্থ হয়। এদিকে তার বাবা মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজতে আরম্ভ করেন। কন্যার রূপের ওপর তার ভরসা থাকলেও পাত্রপক্ষের দৃষ্টি কেবল অর্থের ওপর। চাকুরিজীবী অবিবাহিত ছেলেদের মনস্তত্ত্বেরও বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। শুভ্রা লক্ষ করেছে, "এইসব মধ্যবিত্ত তরুণরা বড় বড় কথা বলে, অফিসে পাড়ায় বিপ্লব করে, কিন্তু পণের টাকা, কন্যার কোষ্ঠী মিলিয়ে ছাড়া বিয়ের কথা ভাবতে পারে না।" (সমরেশ, ২০১৪ : ৪৯০)

একদিন ট্রেনের কামরায় সন্ধ্যা নামের এক মেয়ের সঙ্গে শুভ্রার আলাপ হয়। মেয়েটি বেশভূষায় যথেষ্ট আধুনিক। সন্ধ্যা নিজেকে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মী বলে পরিচয় দেয়। সহযাত্রিনীরা তাকে এড়িয়ে চললেও সে আমলে নেয় না। শুভ্রার মনে হয়েছে মেয়েটি যেন "সর্বদাই জ্বলছে, ফুঁসছে" (সমরেশ, ২০১৪ : ৪৯২)। শুভ্রার মতো সন্ধ্যার জীবনযাপনও মসৃণ নয়। তার পরিবার দেশভাগের শিকার। পূর্ববঙ্গের ভিটেমাটি ছেড়ে তারা রাতারাতি চলে আসে কলকাতা। এখানে সামান্য জমি দখল করে তার পিতা বসতি স্থাপন করে। আট ছেলেমেয়ের উদরপূর্তির কোনোরকম ব্যবস্থা করলেও তিনি লেখাপড়া শেখাতে পারেননি। সন্ধ্যা নিজের চেষ্টায় রিফিউজি স্কুলে সামান্য বিদ্যালাভ করে। তার ভাইয়েরা শিক্ষাবঞ্চিত হয়ে অপরাধজগতে জড়িয়ে পড়ে। রাজনীতির নামে তারা ওয়াগন ভাঙে, দলাদলি-মারামারি করে। ভাইয়ের বন্ধুদের কাছেই সন্ধ্যা নিজগৃহে প্রথম ধর্ষিত হয়। কিছুদিন পর তারা অন্য মেয়েদেরও এ-বাড়িতে আনে এবং অনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকে। এসময় তাদের বাড়িতে ভালো খাবারের আয়োজন হয়; তারা নতুন পোশাক এবং নগদ অর্থ পায়। সন্ধ্যার মা আবার এই টাকা থেকে নিজের অংশ দাবি করে এবং না পেলে অশ্লীল গালাগালি আরম্ভ করে। তার বাবা এসব নিয়ে ক্ষুব্ধ হলেও ছেলেদের দাপটের কাছে তা অর্থহীন হয়ে ওঠে।

উদ্বাস্তু জীবনের নিদারুণ বাস্তবতা এটিই যে, পরিবারের সদস্যদের মৌন সম্মতিতে সন্ধ্যার সতীত্বনাশ ঘটে। কলকাতার নতুন পরিবেশে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির লক্ষ্যে নিজ বোনকে ব্যবহার করে তার ভাইয়েরা। পারিবারিক সম্পর্ক ও মূল্যবোধের ভয়ঙ্কর বিপর্যয় প্রত্যক্ষ করে সন্ধ্যা এবার নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্ধকার জগতে। ক্রমশ সে সিগারেট এবং মদ্যপানে আসক্ত হয়ে ওঠে এবং প্রতিনিয়ত ধর্ষিত হওয়ার পরিবর্তে সে দেহব্যবসায়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে। ষোল বছর বয়সে সন্ধ্যাকে দেখা যায় কলকাতার খালিকুঠি বেশ্যালয়ে। পেশা ঘৃণিত হলেও সে যথেষ্ট রোজগার করে। ছোটো দুই বোনও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে। অর্থ যে পথেই আসুক, সন্ধ্যা নিষিদ্ধ জীবনকে ভালোবেসে ফেলে। অন্য মেয়েদেরও সে চাকুরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে পতিতাবৃত্তিতে জড়িয়ে ফেলে। তার এ পর্যায়ের শিকার শুভ্রা "মেয়েটার চেহারাটি বেশ মিষ্টি, চোখে পড়বার মতো। একবার হাত করতে পারলে কাজ ভালোই দেবে।" (সমরেশ, ২০১৪ : ৪৯৪)

পরিকল্পনা অনুযায়ী সন্ধ্যা প্রায় বিকেলে শুভ্রার ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে চলে আসে এবং তাকে নিয়ে রেস্টুরেন্টে গল্প করে। শুভ্রাকে সে মাঝেমধ্যে বেলা বউদির বাড়িতে নিয়ে যেতে চায়। সন্ধ্যার ভাষ্যানুযায়ী—বউদির স্বামী বড় ব্যবসায়ী, গাড়িয়াহাটে তার কাপড়ের ব্যবসায় রয়েছে। তবে ভদ্রলোক বাড়িতেই বেশিক্ষণ থাকে। এক বিশ্বস্ত কর্মচারী তার প্রতিষ্ঠান দেখাশোনা করে। সন্ধ্যার ক্রমাগত অনুরোধে শুভ্রাকে একদিন বউদির ফ্ল্যাটে যেতে হয়। তবে শুরুতেই তার মনে সন্দেহ জাগে। ফ্ল্যাটটি যথেষ্ট পরিপাটি, সেখানে কোনো ছেলেমেয়ে নেই; উপরন্তু বেলা বউদি এবং তার কথিত স্বামীকে মদ্যপ মনে হয়। শুভ্রাকে দেখে লোকটি বলেই ফেলে, "বাঃ এ যে দেখছি খাসা। ওকে কোথা থেকে যোগাড় করলে বেলা" (সমরেশ, ২০১৪ : ৪৯৫)? তিন তলায় সে আরেকজন মদ্যপ যুবককে দেখতে পায়। সন্ধ্যা লোকটিকে বউদির 'দেওর' বলে পরিচয় করিয়ে দিলেও শুভ্রা বিশ্বাস করেনি। এসময় বাড়িতে তিন-চারজন মেয়ের সঙ্গে আরো দুজন পুরুষ প্রবেশ করে। শুভ্রা বুঝতে পারে, সে এক নারকীয় ফাঁদে আটকে পড়েছে। সন্ধ্যার প্রাইভেট ফার্মে চাকরির নগ্নরূপ তার সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে সন্ধ্যার কাছে মুক্তি কামনা করে, সন্ধ্যাও তাকে অভয় দিয়ে বলে, "ভয় পেয়ো না। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ তোমাকে জোর করে কিছু করবে না।" (সমরেশ, ২০১৪ : ৪৯৬)

বিদায়কালে বউদি শুভ্রাকে পঞ্চাশ টাকা উপহার দেয়। তবে এই পাপের অর্থ গ্রহণ করতে সে অস্বীকৃতি জানায়। বউদি এরূপ প্রত্যাখ্যানে হতাশ হয় না। কারণ সে জানে, শুরুতে পালিয়ে গেলেও অভাবের যন্ত্রণায় অনেকেই তার কাছে ফিরে আসে। পরদিন শুভ্রার বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই দুঃসময়ে সন্ধ্যা পাশে দাঁড়ালেও শুভ্রা তাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলে। প্রবলভাবে অপমানিত সন্ধ্যা অশ্রুসিক্ত নয়নে শুভ্রার কাছে জানতে চায় তার প্রাণশক্তির রহস্য। ব্যক্তিগত ক্রোধ সংবরণ করে শুভ্রা উত্তর দেয়, "আমার কাছে জীবনের চেহারাটা অন্য রকম। সুখ আমিও চাই, কিন্তু তার জন্য নিজের সব বিসর্জন দিতে পারব না" (সমরেশ, ২০১৪ : ৪৯৭)। এরপর থেকে সন্ধ্যারও বউদির বাড়ি যেতে আর ইচ্ছে করে না।

শুভ্রা এবং সন্ধ্যার পারিবারিক কাঠামো প্রায় অভিন্ন, কিন্তু দুজনের মনস্তত্ত্বের ব্যবধান বিস্তর। একজন দারিদ্র্যকে জয় করলেও অন্যজন দারিদ্র্যের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছে। নিবিড় পর্যবেক্ষণে বোঝা যায়, শুভ্রা উত্তরাধিকারসূত্রে তার ব্যক্তিচরিত্রে এই চৈত্তিক-দৃঢ়তা অর্জন করেছে। তার বাবা যেমন শত অভাব-অনটনেও কর্মক্ষেত্রে দুর্নীতিগ্রস্ত হননি, ঠিক তেমনি শুভ্রা অর্থের কাছে তার নারীসম্ভ্রম বিসর্জন দেয়নি। এছাড়া তার উচ্চশিক্ষা এবং শুভচিন্তা চারিত্রিক বলিষ্ঠতা অর্জনে যথেষ্ট সহায়ক ছিল। তৎকালীন সমাজবাস্তবতার প্রেক্ষাপটে শুভ্রার সতীত্বরক্ষার সংগ্রাম প্রশংসনীয় হলেও সন্ধ্যার অধঃপতন অস্বাভাবিক নয়। তাই গল্পশেষে

সন্ধ্যার মনে প্রশ্ন জাগে : "জানি না, ঈশ্বর বলে সত্যি কেউ আছেন কী না? থাকলে জিজ্ঞেস করতাম, আমাকে কি শুভ্রার মতো শক্তি দিতে পার না?" (সমরেশ, ২০১৪ : ৪৯৭)

মূলত এ গল্পে সন্ধ্যা কুপথে পরিচালিত হলেও নেতিবাচক চরিত্র নয়। শুভ্রাকে বিপদে ফেলবার উদ্দেশ্য তার ছিল না। সে কেবল নিজের মানদণ্ডে অন্যকে বিচার করতে চেয়েছে। গল্পশেষে শুভ্রার সুচেতনা সন্ধ্যাকে উদ্বোধিত করেছে। তবে সন্ধ্যা সুস্থজীবনে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছাপ্রকাশ করলেও গল্পে এ জীবনের রূপায়ণ নেই।

সমরেশ বসু অসহায় নারীদের রূপোপজীবিনী হয়ে ওঠার কারণগুলো যেমন চিহ্নিত করেছেন, তেমনি দেখিয়েছেন তাদের দুঃখ-দুর্দশার বৃত্তান্ত। নিষিদ্ধ-পল্লিতে আটকে পড়া মেয়েদের অন্তর্যন্ত্রণা এবং তাদের প্রতি সমাজের অসম্মানের চিত্র তাঁর কয়েকটি গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে। 'দেওয়াল লিপি' গল্পের প্লট গড়ে উঠেছে মফস্বলের পতিতা পল্লির সামনে লেখা একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে, যেখানে বলা হয়েছে, "যে এই গলিতে ঢোকে, সে শুয়োরের বাচ্চা" (সমরেশ, ২০১৪ : ৫৩৮)। বিষয়টি থানার নতুন পুলিশ অফিসারের দৃষ্টিগোচর হলে তিনি প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হন। এলাকার পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে তিনি এ ধরনের নোংরা দেওয়ালচিত্রণে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন এবং তৎক্ষণাৎ একজন কনস্টেবলকে দিয়ে দেওয়াল পরিষ্কার করান। এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে তিনি স্থানীয় দোকানিদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এর মধ্যে কয়েকজন সমাজকর্মী তার সঙ্গে দেখা করেন। তারা অফিসারের নিকট একটি স্মারকলিপি উপস্থাপন করেন, যার উল্লেখযোগ্য অংশ নিম্নরূপ :

> আমাদের শহরের ব্যাপার দেখিয়া আমরা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা এই শহরের স্বাধীন নাগরিকরাই, এই দেশে প্রথম দাবি করিতেছি, এই পাপ-ব্যবসার বিলোপ সাধন করিয়া, দেহ-ব্যবসায়ী নারীগণকে সমাজের মঙ্গলময় কাজে লাগানো হউক।
>
> যদি বিলোপ সাধন এখুনি সম্ভব না হয়, তবে ঠাকুরগলির ব্যবসা এই শহর হইতে অন্যত্র উঠাইয়া লওয়া হউক। অন্যথায়, শহরের বুকে, দেওয়ালের কলঙ্ক দূর হইবে না। (সমরেশ, ২০১৪ : ৫৪১)

এদের সুপরামর্শ অফিসারের মনঃপুত হয়নি। তিনি পাপ-বাক্যের অপসারণ চাইলেও পাপের মূল-উৎপাটন করতে চান না। উনত্রিশবার দেওয়াল লিপি পরিষ্কার করে ক্লান্ত অফিসার বদলি হয়ে গেলেও জানা যায়নি দেওয়াল-লেখকের নাম-পরিচয়। তবে পতিতালয়ে আগত লম্পটদের 'শুয়োর'রূপ যে অবান্তর নয়, তা সেখানকার মেয়েরা জানে, "আহা, কী মরণ গো! এত দাপাদাপি কিসের। যারা এই গলিতে ঢোকে, তারা তাছাড়া আবার কী।" (সমরেশ, ২০১৪ : ৫৪২)

'দেওয়াল লিপি' গল্পে দেহব্যবসায়ের নেপথ্যের কুশীলবদের শক্তি প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে, যাদের ইশারায় পুলিশ অফিসার দেওয়াল লিপি অপসারণে উদ্যোগী হন। "যে এই গলিতে ঢোকে, সে শুয়োরের বাচ্চা।"—এরূপ বাক্যপ্রয়োগে অফিসারের প্রবল আপত্তি থাকলেও, যারা এই গলিতে নিত্য যাতায়াত করে তাদের ব্যাপারে তিনি নিশ্চুপ। এমনকি পতিতাপল্লি অন্যত্র স্থানান্তর কিংবা এখানকার অধিবাসীদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেও তার কোনো তৎপরতা নেই। এই পুলিশ অফিসার মূলত শহরকে পরিচ্ছন্ন নয়, বরং দেহব্যবসায়কে নিষ্কণ্টক রাখার চেষ্টায় নিয়োজিত থেকেছেন। হয়তো রূপোপজীবিনীদের কষ্টার্জিত অর্থের তিনিও একজন গোপন অংশীদার।

'প্রাণ-পিপাসা' গল্পে পরিদৃষ্ট হয়, রূপোপজীবিনীদের কর্মপদ্ধতি চটকল শ্রমিকদের মতোই। তাদের আবাস-আসবাব সবই মালিকের, তারা শুধু 'খাটতে' আসে। সারারাত লাঞ্ছনাভোগের পর তারা যে অর্থ পায় তা অতিনগণ্য। উপরন্তু তাদের শরীরে বাসা বাঁধে প্রাণঘাতী অসুখ, যা

চিকিৎসার সামর্থ্য তাদের নেই। মূলত গণিকাবৃত্তিও এক প্রকার বাণিজ্য এবং এ বাণিজ্যে "বিনিয়োগের তুলনায় লাভ অনেক বেশি। এ বাণিজ্যের ওপর বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা থাকায় গোপনে এক বিশাল অপরাধচক্র নিয়োজিত হয় অসহায় নারীদের শোষণ করে মুনাফা লাভের নেশায়। দাসপ্রথা বহুকাল আগে বিলুপ্ত হলেও এই শোষণের চক্র পৃথিবীব্যাপী এক নব্য দাসপ্রথা চালু রেখেছে।" (মনিরুল, ২০২০ : ১৬৮)

'প্রাণ-পিপাসা' গল্পের কথক একজন ভবঘুরে; কয়েকদিন নিশ্চিত আশ্রয়ের সন্ধানে সে নৈহাটিতে এক বন্ধুর কাছে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে প্রবল বৃষ্টিপাত শুরু হয় এবং রাস্তার ধারে এক নারীর আহ্বানে সে তার ঘরে আশ্রয় নেয়। যদিও ঘরের পরিবেশ স্বস্তিদায়ক নয়—"ঘরের মেঝেও টালির ফাঁক দিয়ে জল পড়ে ভিজে গেছে। তক্তপোশের বিছানাটা ভেজেনি। ঘরের মধ্যে আছে দু-চারটে সামান্য জিনিস, থালা গেলাস কলসি" (সমরেশ, ২০১৪ : ১৯৫)। কিছুক্ষণ পর গল্পকথক মেয়েটির প্রকৃত পরিচয় উপলব্ধি করে এবং মেয়েটিও তাকে রাতের অন্য অতিথির ন্যায় বিবেচনা করে। এসময় গল্পকথক মেয়েটিকে তার আর্থিক দুরবস্থা জানিয়ে দেয়, "মিছে ডেকেছ, এদিকে পকেট কানা" (সমরেশ, ২০১৪ : ১৯৬)। রোজগারের উপায় হারিয়ে মেয়েটি বিপন্নবোধ করে। গল্পকথক তার ব্যবসায়িক ক্ষতি চায়নি, তাই সে দ্রুত স্থানত্যাগে উদ্যত হয়। অন্যদিকে রূপোপজীবিনী হলেও মেয়েটি অমানবিক নয়। দুর্যোগঘন রাতে সে অতিথিকে আশ্রয়চ্যুত করেনি, বরং তার সাধ্যানুযায়ী 'ভাত-চচ্চড়ি' দিয়ে আপ্যায়ন করেছে। বৃষ্টিভেজা রাতে পাশাপাশি শুয়ে যন্ত্রণাকাতর মেয়েটির কাছ থেকে গল্পকথক জানতে পারে ওর চরম অসুস্থতার কথা :

> বললাম, তা বলই না কেন রোগটা।
> যা হয় এ লাইনে থাকলে – সে বলল।
> লাইনে থাকলে? সর্বনাশ! ভীষণ সিটিয়ে গেলাম। ভয়ে ঘৃণায় জিজ্ঞেস করলাম, এর উপরও সন্ধ্যারাত্র–
> নিশ্চয়ই।
> পাঁচজন – সে বলল।
> ইস্! কী সাংঘাতিক! বললাম, চিকিচ্ছে করাও না কেন?
> পয়সা পাব কোথায়?
> কেন? নিজের রোজগার?
> সে তো মনিবের পয়সা।
> মনিব? এটা কি চাকরি নাকি?
> নয়তো কী? মনিবের ব্যবসা. ঘরদোর জায়গা জিনিস। আমরা আসি খাটতে। (সমরেশ, ২০১৪ : ১৯৯-২০০)

এই হচ্ছে রূপোপজীবিনীদের প্রকৃত জীবনচিত্র। নানা ধরনের মানুষের সংস্পর্শে এসে তারা জটিল যৌনরোগে আক্রান্ত হয় এবং একরকম বিনা চিকিৎসায় অকালমৃত্যুর শিকার হয়। সমরেশ বসু তাদের অন্দরমহলের বাস্তব চেহারা নির্মোহভাবে গল্পে উন্মোচন করেছেন। রূপোপজীবিনীর শারীরিক বর্ণনার ক্ষেত্রেও তিনি কল্পনাপ্রবণ নন : "সমস্ত মুখটি লাঞ্ছনায় ভরা, আকাশমুখো নাক, মোটা ঠোঁট।" (সমরেশ, ২০১৪ : ২০০)

'বিষের ঝাড়' গল্পেও রূপোপজীবিনীদের স্বাস্থ্যসংকটের কথা উচ্চারিত হয়েছে। অতিরিক্ত যৌনসঙ্গমের দরুন তারা সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। এ গল্পে পতিতা-পল্লিতে চিকিৎসা করে হারাধন নামের এক হাতুড়ে ডাক্তার। হারাধন জাতিতে ব্রাহ্মণ, ইতঃপূর্বে নানা পেশায় অকৃতকার্য হয়ে সে রূপোপজীবিনীদের ডাক্তার হয়। এজন্য চলতিপথে সে কৌতুকের স্বীকার হয়; তথাপি ক্ষুধার্ত স্ত্রী-সন্তানদের মুখায়বব ভেবে সে চক্ষুলজ্জা উপেক্ষা করে। প্রথমদিকে

অজানা পল্লির প্রতি হারাধনেরও কৌতূহল ছিল। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় সে হয়ে ওঠে এদের সুখ-দুঃখের ভাগীদার। নির্যাতিতা মেয়েদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যাপারে সে বিভিন্ন পরামর্শ দেয়। একদিন পুতুল নামের এক মেয়ের শরীরে ইনজেকশন প্রয়োগকালে সে সতর্ক করে : "একটু দেখে শুনে মানুষ ঘরে তুলতে পারিসনে, অ্যাঁ" (সমরেশ, ২০১৫ : ৪৯৬)। এতদিন এই পল্লিতে বিচরণ করলেও হারাধন যে সত্যটি উপলব্ধি করেনি, পুতুল তা শুনিয়ে দেয় : "তা কি হয় বাউনবাবা? খদ্দের কানা হোক, খোঁড়া হোক, সে যে ভরসা।" (সমরেশ, ২০১৫ : ৪৯৬)

নিজ পেশার প্রতি দায়িত্বসচেতন হলেও এর উপযুক্ত প্রতিদান নেই। এদিন পুতুল ডাক্তারের সম্পূর্ণ পাওনা পরিশোধ করতে পারে না। নিষিদ্ধ-পল্লির আরেক মেয়ে চণ্ডীরও একইদশা। হারাধন যখন তার ঘরে উপস্থিত হয়, তখনও মেয়েটি বিবস্ত্রা। এক খরিদ্দার কিছুক্ষণ পূর্বে ঘরত্যাগ করেছে। চিকিৎসার প্রাক্কালে হারাধন মেয়েটিকে পোশাক পরিধান করতে বলে। চণ্ডীও ডাক্তারের পারিশ্রমিক প্রদানে অপারগ, এর পরিবর্তে সে এক সের চাল এগিয়ে দেয়। চালের গন্ধে হারাধন বিমোহিত হয়ে পড়ে, নিমিষেই এক মুঠো চাল নিয়ে সে চিবুতে থাকে। কিন্তু যখন জানতে পারে চণ্ডীর চালের ভাণ্ডার শূন্য, তখন সে এ দক্ষিণার পুরোটা গ্রহণ করতে পারে না। মেয়েটিকে চালের অর্ধেকটা ফেরত দিয়ে সে যথারীতি সাবধান করে : "দু-একটা রাত একটু কামাই দে, কামাই দে" (সমরেশ, ২০১৫ : ৪৯৮)। প্রত্যুত্তরে চণ্ডীও পুতুলের মতো তার অসহায়ত্ব প্রকাশ করে : "এ জীবনে আর কামাই দেওয়া হবে না। এক রাত্রিও থামাতে পারা যাবে না। এ শরীরের বিশ্রাম নেই। পারলে কি নিজের মুখের ভাত কেউ তুলে দেয়!" (সমরেশ, ২০১৫ : ৪৯৮)

হারাধনের পরবর্তী রোগী সরলা। ওর চেহারা অনেকটা ডাক্তারের সেজো মেয়ের মতো। তাই মেয়েটিকে সে বিশেষ স্নেহ করে। সঙ্গীদের মতো সরলারও চিকিৎসার সামর্থ্য নেই। তাই ডাক্তারের কাছে সে করুণকণ্ঠে অনুকম্পা প্রার্থনা করে। এসময় এক প্রভাবশালী খদ্দের তাকে আহ্বান করে এবং সরলার নিস্পৃহতার পরিপ্রেক্ষিতে সে কিষণ নামের এক গুণ্ডাকে ডাকতে থাকে। "কিষণ এখানকার বেয়াদপ মেয়েদের যম" (সমরেশ, ২০১৫ : ৪৯৯)। অনন্যোপায় হয়ে সরলা লোকটির হুকুম পালন করে। নিষিদ্ধ-পল্লির মেয়েদের কোনো ব্যক্তিস্বাধীনতা নেই। ক্ষুধা এবং ক্ষমতার কাছে পরাজিত হয়ে তারা ক্রমাগত শরীরকে বিষাক্ত করে ফেলে এবং যৌবনশেষে অনিবার্য মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে। বাইরের আলো ঝলমল পরিবেশের বিপরীতে এটিই হচ্ছে বাস্তবসত্য। সমরেশ বসুর গল্পের এ শ্রেণির চরিত্রের সঙ্গে শরৎচন্দ্র-সৃষ্ট চরিত্রগুলোর যে বড় পার্থক্য রয়েছে, তাও সূচিত হয়েছে এ গল্পে। প্রাসঙ্গিক বর্ণনা উদ্ধৃতিযোগ্য :

> রানী খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, 'ছোঁড়ার মরণ ধরেছে। চন্দ্রমুখীটা কে বাউনবাবা?'
> 'সে এক গল্পের বেবুশ্যে। শরৎ চাটুয্যের নাম শুনেছিস?'
> 'নরসিং চাটুয্যেকে তো চিনি, ও নাম তো জানি না।'
> হারাধন বলল, 'তিনি বেবুশ্যেদের গল্প লিখতেন, খুব নামী লোক ছিলেন রে।' পরমুহূর্তেই মুখটা ঘোঁচ করে বলল, 'তা বলে তিনি তোদের মতো হাভেতেদের কথা লেখেননি; যাদের কথা লিখতেন, তাদের একটা প্রাণ ছিল।' (সমরেশ, ২০১৫ : ৪৯৯)

উপর্যুক্ত বর্ণনাংশে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি সমরেশের অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবোধ প্রতিফলিত হয়েছে। তবে শরৎ-সাহিত্যে বর্ণিত "পতিতা নারীসমাজ প্রেমের মহিমায় কারো চেয়ে তুচ্ছ নয়, নগণ্য নয়। তাদের একনিষ্ঠ প্রেমের সঞ্জীবনী স্রোতে অবগাহন করে তৃপ্ত স্নিগ্ধ হয়েছে পুরুষের হৃদয়" (গোপিকানাথ, ২০১০ : ১২২)। অন্যদিকে সমরেশ বসু কোনো ভাববিলাস নয়, এক-একজন সাধারণ রূপোপজীবিনীর জীবনবিপর্যয়ের গল্প বলেছেন।

সমাজের নিম্নবিত্ত নারীরা অকাল বৈধব্যের শিকার হয়ে প্রভাবশালীদের ভোগ্যবস্তুতে পরিণত হয়। এদের সঙ্গে যারা ফূর্তি করে তারা আবার নিজেদের কলঙ্কমুক্ত প্রমাণ করতে চায় এবং

নিঃস্ব নারীকে নিয়ে অতিরঞ্জিত বক্তব্য দেয়। সমরেশ বসু 'পঞ্চায়েত' গল্পে এ ধরনের ভণ্ডামির মুখোশ উন্মোচন করেছেন। এ গল্পে শুকালুর বিধবা স্ত্রী কুনতির চারিত্রিক স্খলনের অপরাধে বিচার বসে। শুকালু পার্শ্ববর্তী চটকলের শ্রমিক ছিল। আজন্ম গ্রামীণ পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠা ছেলেটি চটকলের হাড়ভাঙা পরিশ্রম সহ্য করতে পারেনি। তাই অল্পদিনের মধ্যে তার মৃত্যু হয়। এরপর কুনতির শারীরিক সৌন্দর্য তার বিপত্তির কারণ হয়। বস্তির পুরুষদের কাছে সে হয়ে ওঠে 'বেওয়ারিশ আওরৎ'। তার সন্তানরাও মায়ের দুর্বলতা উপলব্ধি করে : "জন্মের পর থেকে ওরা দেখেছে, যারা মায়ের সঙ্গে কথা বলে তারা সকলেই মতলববাজ।" (সমরেশ, ২০১৪ : ৫৯১)

শুকালুর মৃত্যুর পর এক ব্যক্তি কুনতিকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঘরে তোলে এবং কিছুদিন পর তাকে চটকলের সর্দারের সঙ্গে আলিঙ্গনে বাধ্য করে। এরপরও কুনতি নানাজনের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছে; কিন্তু কেউ তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেয়নি, এর পরিবর্তে সে পেয়েছে মাতালদের প্রহার আর গর্ভে সন্তান। শুকালুর বন্ধু হীরালাল নানাভাবে সাবধান করলেও কুনতির গত্যন্তর ছিল না। বস্তির অন্য নারীরাও স্বামীর গতিবিধি নিয়ে সর্বদা দুঃশ্চিন্তায় থাকে এবং স্বামীকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়ে তারা কুনতির ওপর চড়াও হয়। পঞ্চায়েতে বস্তির নারীদের আস্ফালনই তাই বেশি ছিল :

> ক. কে বলবে ওই বাচ্চা তিনটের মা ওই মাগী। (সমরেশ, ২০১৪ : ৫৮৯)
> খ. রেণ্ডির আবার শরম। জোয়ানী উমরে আমাদেরও গোলমাল হয়েছিল। পঞ্চায়েত হয়েছিল, সাজা দিয়েছিল। তা আমরা কি ওই হারামজাদীর মতো বসেছিলাম। বুক অবধি ঘোমটা ছিল – হ্যাঁ। (সমরেশ, ২০১৪ : ৫৯২)
> গ. মাগীকে কবুল খেতে হবে, ওর বাচ্চাগুলোর বাপ কে। (সমরেশ, ২০১৪ : ৫৯৭)

এই পঞ্চায়েতের সভাপতি চটকলের হেডসর্দার হড়কু ঠাকুরজী। ব্রাহ্মণ হলেও সে লাম্পট্য এবং অপকর্মে অদ্বিতীয়। মাতাদীন নামের এক ব্যক্তি তাকে দেখে বলে, 'লুচ্চা কাঁহিকা'। ঠাকুরজী সুদি কারবারের সঙ্গে জড়িত, ডোমপাড়ার সন্নিকটে তার নিয়ন্ত্রিত একটি পতিতা-পল্লিও রয়েছে। এ-ব্যাপারে তার নিজস্ব ব্যাখ্যা ছিল এরকম : "ঘরের ময়লা সাফ করে ফেলবার জন্য একটা আঁস্তাকুড় তো চাই। সে তোমার দেওতার রাজত্ব স্বর্গেও খানিক আঁস্তাকুড় আছে। দুনিয়ার নিয়ম এটা" (সমরেশ, ২০১৪ : ৫৯৩)। এভাবে ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে সে অশিক্ষিত শ্রমিকদের কাছে নিজের অপকর্মের বৈধতা দেওয়ার অপচেষ্টা করে। বিচারকালে সে কুনতির অদৃষ্টকে দায়ী করে এবং তাকে বস্তি থেকে বিতাড়িত করার রায় প্রদান করে। একইসঙ্গে কুনতির জরিমানা হিসেবে সে পঞ্চাশ টাকা ধার্য করে। তার এই বিচারিক সিদ্ধান্তের অন্তরালে ছিল ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থের চক্রান্ত। সে জানে, কুনতির পক্ষে জরিমানা পরিশোধ করা সম্ভব নয়। তাই কুনতির হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে সে তাকে কুক্ষিগত করবার পরিকল্পনা আঁটে। তার কূটবুদ্ধি বুঝে উঠতে কুনতির বিলম্ব হয় না। অপরিসীম ঘৃণায় জলন্ত হেসে সে ঠাকুরজীকে বলে, "তোমার লাইনে তবে একটা ঘর বন্দোবস্ত করে রেখ" (সমরেশ, ২০১৪ : ৬০১)! গল্পশেষে কুনতিকে হড়কু ঠাকুরজীর কূটজালে আটকে পড়তে হয়নি। এ অপদশা থেকে হীরালাল তাকে উদ্ধার করে এবং নতুন সংসার গড়বার প্রত্যয় প্রকাশ করে। সমরেশ বসু তাঁর গল্পে রূপোপজীবিনীদের প্রতি কেবল সহানুভূতি প্রকাশ করেননি, তাদের সামাজিক অবস্থানও নিশ্চিত করতে চেয়েছেন।

কুনতির মতোই পঙ্কিল জীবনাবর্ত থেকে আলোকময় জীবনের সন্ধান পেয়েছে 'মেঘলা ভাঙা রোদ' গল্পের ফুলমণি। স্বামী পরিত্যক্তা মেয়েটির নির্দিষ্ট আবাস-আশ্রয় নেই। এক ঝড়ের রাতে সে যখন রাস্তায় একাকী দাঁড়িয়েছিল, তখন তাকে ট্রাকে তুলে ধর্ষণ করে ভন্টা নামের এক কুলি। ড্রাইভার বিশুকেও সে এ-কাজে প্রলুব্ধ করে। বিশু মাঝেমধ্যে 'মেয়েপাড়া'য় গেলেও

ভন্টার মতো উচ্ছৃঙ্খল নয়। কিছুদিন পূর্বে তার স্ত্রীবিয়োগ ঘটেছে। তাই মেয়েটিকে সে নিজ ঘরে নিয়ে আসে। স্ত্রীসঙ্গ-বিবর্জিত বিশু এ রাতে চরম উত্তেজনায় অভাবে অপুষ্ট মেয়েটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় :

> এটা মেয়েপাড়ার আলোঝলকানো, নগদ-দামে-কেনা বেলেল্লাপনা নয়। নয় মাপা জলের তৃষ্ণা মেটানো। পথ থেকে কুড়িয়ে আনা, পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা নয়, ষোল আনা। সবটাই লাভের। পিঁপড়েয় যেটা খাবে সেটা মেয়েটাকেই খাবে। যতখানি খুশি, যা খুশি তাই করে, ফেলে দিলেই হবে। নিরুঙ্কুশ স্বাধীনতা। (সমরেশ, ২০১৪ : ২৮১)

যেখানে চারদিকে লালসার হিংস্র থাবা, সেখানে অনাথ মেয়েটির এটিই হচ্ছে স্বাভাবিক পরিণতি। এ ধরনের পরিস্থিতি প্রতিনিয়ত মোকাবেলা করবার শক্তি বা সাহস তার নেই। তাই এ অত্যাচারকে সে নিয়তি হিসেবে মেনে নেয়। নির্যাতনভোগের বিনিময়ে দু-একবেলা খেতে পেলেই সে সন্তুষ্ট। তাই বিশুকে প্রতিরোধ নয়, নীরবে বরণ করতে সে প্রস্তুত হয়। সকালে বিশু মেয়েটিকে ছেড়ে দেয় না, ঘরে তালাবন্দি করে কাজে যায়। পরদিন বিশু মেয়েটিকে তার মৃত স্ত্রীর লাল শাড়ি পরিধান করতে বলে। এসময় ওর সুসজ্জিত রূপ দেখে সে আশ্চর্য হয়। এদিন উভয়ের প্রথম কথোপকথন হয় :

> 'স্বামী নেই?'
> – 'না।'
> ...'ফেলে পালিয়েছে বুঝি?'
> – 'হ্যাঁ।'
> – 'কোত্থেকে আসা হয়েছিল?'
> – 'দক্ষিণ থেকে।'
> – 'পেটে খেতে না পেয়ে?'
> – 'হ্যাঁ।'
> – 'ছেলেপুলে নেই?'
> – 'মরে গেছে।'
> – 'আর তুমি কী করছিলে পথে পথে?'
> ...'কী আর করব ! যার যা খুশি তাই করছিল।'
> ... 'মানে? মানে, আমার মতো?'
> – 'হ্যাঁ, একরকমই।' (সমরেশ, ২০১৪ : ২৮৫-২৮৬)

ফুলমণি অবলীলায় তার ওপর অন্য পুরুষদের অকারণ অধিকারের ফিরিস্তি তুলে ধরে। কিন্তু বিশু তা সহজভাবে মানতে পারে না। রাগে, ঘৃণায় সে তাকে চপেটাঘাত করে। সহায়-সম্বলহীন নারীর এ লাঞ্ছনা যে নিত্যদিনের—তা সে বুঝতে চায় না। বস্তুত ফুলমণিকে বিশু মনের অলক্ষ্যে ভালোবেসে ফেলে। তাই প্রতিদিনের মতো ফুলমণিকে সে বিতাড়িত করতে চাইলেও শেষাবধি স্থায়ীভাবে ঘরে রাখার চিন্তা করে। এভাবে গল্পে এক রূপোপজীবিনীর আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠিত হয়। লক্ষণীয় যে, এ গল্পে বিশুও ব্যতিক্রমধর্মী পুরুষ চরিত্র। সে বারবার ভয়ঙ্কর আক্রোশে ফুলমণির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছে, কিন্তু অজানা কারণে নিজেকে সংযত রেখেছে। বিশুর মনের সুপ্ত নীতিচেতনা এই মিলনকে সম্ভব করেছে।

সাতচল্লিশের পর থেকে পশ্চিমবাংলায় চাকরির বাজার ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি অংশ জীবিকার প্রশ্নে কলকারখানায় যুক্ত হতে থাকে। বিদ্যার্জনের সমুচিত মূল্যায়ন না পেয়ে এরা হতাশাগ্রস্ত হয় এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অনেকে মদ ও পরনারীতে আসক্ত হয়। চাকরির মাইনে পেয়ে কেউ-কেউ পতিতালয়ে যায়। 'মাসের প্রথম রবিবার' গল্পে এমন প্রসঙ্গই উত্থাপিত হয়েছে। এ গল্পে ভুণ্ডুল দত্ত এবং পেটো গ্র্যাজুয়েট,

তথাপি তারা চটকলে কাজ করে। একজন সেখানকার কেরানি, অন্যজন জুনিয়র সুপারভাইজার। চটকলের সারামাসের ক্লান্তি এবং অন্তরের গ্লানি থেকে মাসের প্রথম রবিবার তারা মুক্তি খোঁজে। এদিন তারা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা মদ্যপান করে। ছুটির রাতে তাদের মাঝেমধ্যে পাওয়া যায় বালিপুকুরের বস্তিতে, এটি স্থানীয় 'বেশ্যালয়' – যেখানে "বাজারের মুখ চেনা ফড়িয়া, মাছ বিক্রেতা, কারখানার শ্রমিক আর রিকশাওয়ালারাই প্রধান খরিদ্দার" (সমরেশ, ২০১৫ : ৩০৮)। বস্তির একপাশে জায়গা করে নিয়েছে হিজড়া সম্প্রদায়। ভুণ্ডুলের সহকর্মী কালীতোষ এই পল্লিতে নিত্য যাতায়াত করে। খুসী নামের এক মেয়ে তার ব্যক্তিগত রক্ষিতা। এখানে হাবি নামের এক প্রতিবন্ধী মেয়ে ভুণ্ডুলের দৃষ্টি কাড়ে। মেয়েটি বোবা, বধির; ওকে দেখে ভুণ্ডুলের মনে প্রশ্ন জাগে, "এরকম একটা মেয়ে এই পেশায় এল কী করে" (সমরেশ, ২০১৫ : ৩১১)। তার কৌতূহলের উত্তর মেলে খুসীর জবানিতে :

> এসেছিল তো একটা পোড়া কাঠ। কোলে আবার কয়েক মাসের ছেলে। ছেলেটা মরে বেঁচেছে। সবিতাদের বাড়িতে বাসনকোসন মাজত। পেটে ভাত পড়তেই দেখা গেল ছুঁড়ির গতরে চেকনাই মারছে। সাত ভূতে ছিঁড়ে খেতে আরম্ভ করেছিল। কী দরকার বাবা? নিজেদের মধ্যে ঠিকঠাক করে এই ঘরে এনে বসালাম, এখন দিব্যি করে খাচ্ছে। (সমরেশ, ২০১৫ : ৩১৩)

'সাত ভূতে'র ক্রমাগত আক্রমণ থেকে বাঁচাতে খুসী হাবিকে এই পল্লিতে নিয়ে আসে। এখানে কষ্ট আছে, রয়েছে নির্যাতনভোগ; তারপরও মেয়েটি একটি পেশাগত পরিচয় এবং কিছু সঙ্গী পায়। গল্পে ভুণ্ডুলের সঙ্গে হাবির মিলনের যে বর্ণনা রয়েছে তা আদিরসাত্মক; তবে উত্তেজনার অন্তরালে সমরেশ বসু সেখানে উদ্বেগ সঞ্চার করেছেন :

> হাবি ভুণ্ডুলের বুকে আঙুলের খোঁচা দিয়ে হাসলো। গলা থেকে সেই অদ্ভুত কুঁইকুঁই শব্দ করে ঘাড়-বাঁকিয়ে ত্যারছা চোখে তাকাল। ওর শরীরের একটা পাশ ভুণ্ডুলের শরীরে লেপটানো। ভুণ্ডুল চোখের পাতা টান টান করে তাকাল। হাবির চুলে হাত দিল, 'চুল এত ছোট কেন?' ঠোঁটি ঠোঁটি? অসুখ করেছিল? (সমরেশ, ২০১৫ : ৩১৫)

ভুণ্ডুলের কাছে শেষাবধি শরীর নয়, প্রতিবন্ধী মেয়েটির দুর্দশাই গুরুত্ব পায়। জিজ্ঞাসাবাদে হাবি ইশারায় বুঝিয়ে দেয়—তার মাথার চুল দেশলাইয়ের কাঠিতে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যজন ছুরি দিয়ে তাকে 'ফালা ফালা' করতে চেয়েছে, গালের কাটা দাগটি সেই চিহ্ন বহন করছে। শুধু তাই নয়, "হাবি প্রায় ওর সারা নিম্নাঙ্গটাই দেখাল। কাটা দাগে ভরা" (সমরেশ, ২০১৫ : ৩১৬)। ভুণ্ডুলের মতো শিক্ষিতরাই কেবল হাবির খদ্দের হয়ে আসে না, তার সঙ্গে রাত কাটায় মাতাল সন্ত্রাসীরাও। এরা কেবল শারীরিক তৃষ্ণা মিটিয়ে ক্ষান্ত হয় না, নিজেদের পশুত্বকেও প্রকাশ করে। আনন্দপ্রাপ্তির ন্যূনতম ঘাটতি হলে তারা অমানুষিক আচরণ করে।

'মাসের প্রথম রবিবার' গল্পে হাবি রূপোপজীবিনী হয়েও মমতাময়ী নারীরূপে চিত্রিত হয়েছে। ভুণ্ডুলকে সে শুধু দেহদান নয়, পরিবেশন করে রাতের খাবার। পান্তাভাত, বসন্তকালের নতুন লেবু, সরিষার তেল আর কাঁচা লঙ্কার সাথে সে পাতে দেয় সোনা খড়কে মাছ। রূপোপজীবিনীর ঘরে এটিই হয়তো সবচেয়ে উপাদেয় আয়োজন। হাবি অতিথির মুখে নিজেই অন্ন তুলে দেয়। তখন "চোখে কি ওর স্নেহ; অথচ সংকুচিত জিজ্ঞাসা? ভুণ্ডুলের মুখের ভিতর খাদ্যের স্বাদে লালা উপছে এল, আর চোখ দুটোও যেন জ্বালা করে ঝাপসা হয়ে উঠল" (সমরেশ, ২০১৫ : ৩১৭)। সমরেশ বসু এ গল্পে রূপোপজীবিনীদের ক্রীড়াময়ী রূপ কিংবা বেদনাবিধুর জীবনচিত্রণের পাশাপাশি তাদের নারীত্বের চিরন্তন বৈশিষ্টগুলো শিল্পায়িত করেছেন।

সমরেশের 'উৎপাত' গল্পে স্ত্রীর স্বৈরিণী-স্বভাবে তার স্বামী বিষিয়ে উঠলেও অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতায় মৌন থেকেছে। 'আলোর বৃত্তে' গল্পে পরিলক্ষিত হয় এর ভিন্নরূপ। এখানে স্বামীই অর্থকষ্টে দিশেহারা হয়ে স্ত্রীকে গণিকাবৃত্তিতে বাধ্য করেছে। এ গল্পে কেদার এবং টগর

জাতিতে নমঃশূদ্র। বাল্যকালে তাদের বিয়ে হয় এবং বিয়ের দুবছর পর তারা দাঙ্গা-দেশভাগের শিকার হয়। এরপর বাস্তুচ্যুত হয়ে তারা কলকাতার ফুটপাতের ওপর একটি 'খুপরি'তে আশ্রয় নেয়। এখানে "এক-একটা পুরো পরিবার এক-একটা খোপে। হোগলা গোলপাতা, ছেঁচা বেড়া, টিনের টুকরো, নানান জোড়াতালিতে খুপরিগুলি তৈরি" (সমরেশ, ২০১৫ : ৪১৩)। উদ্বাস্তু দশায় কেদার বিভিন্ন কাজের চেষ্টা করেছে। কিন্তু বাজারে পণ্য খালাসের কাজ ব্যতীত তার ভাগ্যে কিছুই জোটেনি। জীবনযুদ্ধে পরাস্ত কেদার পরবর্তীকালে এক অদ্ভুত নেশায় মেতে ওঠে। শহরের নারীলোভী বাবুশ্রেণির কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নিতে সে স্ত্রীকে 'টোপ' হিসেবে ব্যবহার করে : "শালার ধিঙ্গি শোল যাবে কোথায়? এমন তাজা চকচকে আরশোলার টোপ" (সমরেশ, ২০১৫ : ৪১৫)! এ ব্যাপারে টগর প্রবলভাবে আপত্তি করে। কিন্তু কেদার তার আবেগকে নাড়া দিয়ে সম্মতি আদায় করে—"একবেলা খাই, টগর তোর প্রাণে একটু দয়া-মায়া নেই" (সমরেশ, ২০১৫ : ৪১৫)? স্বামীর হৃদয়স্পর্শী অনুনয়ে টগর বিগলিত হয় এবং প্রতি রাতে ঘুমন্ত সন্তানকে ঘরে রেখে তারা শিকার সন্ধানে যায়। নির্ধারিত স্থানে আবির্ভূত হয় কেদারের দুই সহযোগী : রতন এবং বিষ্টু। উৎসুক কাউকে দেখলে তারা টগরকে সংকেত করে :

> সাবধান। শিকার সামনে। আস্তে চল। আরো আস্তে। তাকাও। একটু হাসো। বারে বারে তাকাও। অন্যদিকে তাকাবার অবসর দিও না। আর একটু হাসো। ভয় নেই, চোখ নামিও না। দাঁড়াও, দাঁড়িয়ে পড়। (সমরেশ, ২০১৫ : ৪১৬)

শিকার ধরতে তাদের বিলম্ব হয় না। টগরের নিকটবর্তী হয়ে কৌতূহলী পথিক হৃষ্টচিত্তে জিজ্ঞাসা করে, "নতুন নামা হয়েছে বুঝি? তাকাও। ঘরের বউ বলে মনে হচ্ছে" (সমরেশ, ২০১৫ : ৪১৭)। আর তখনই অন্ধকারের অন্তরাল থেকে বিষ্টুরা ত্রাণকর্তা হিসেবে উপস্থিত হয়। সম্মানহানি এবং পুলিশের ভয় দেখিয়ে তারা লোকটির কাছ থেকে নগদ অর্থ আদায় করে, যার একটি অংশ পায় কেদার। এসময় উৎকণ্ঠিত টগর দ্রুত স্থানত্যাগ করে এবং ঘরে এসে তীব্র অপরাধ যন্ত্রণায় জর্জরিত থাকে। এরপর কেদারের আশ্বাসবাণীতে (তুই আর আমি তো সাচ্চা আছি।) সে ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। দ্বিধা-লজ্জা-ভয় কাটিয়ে এক পর্যায়ে টগর নিজেই সজ্জিত হয়ে কেদারকে আহবান করে এবং কেদার অসুস্থ থাকলে পরদিনের খরচ যোগাড়ের চাপে একাই বেরিয়ে পড়ে।

অন্যদিকে কেদারের মধ্যে দেখা যায় লক্ষণীয় পরিবর্তন। সে সবকিছুতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং কারণে-অকারণে টগরের ওপর ক্রুদ্ধ থাকে। স্বামীর নির্দেশে টগর নিজেকে বিকিয়ে দিলেও সেই স্বামীই তাকে 'অসৎ', 'কুলটা' বলে ভর্ৎসনা করে, "এই করেই তোকে চিনতে পেরেছি। বেশ্যা" (সমরেশ, ২০১৫ : ৪২০)। শুধু অপমান নয়, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য কেদার স্ত্রীকে তীব্রভাবে আঘাত করে এবং তাকে হত্যার পরিকল্পনা করে। গল্পশেষে কেদারের বোধোদয় হলেও তাদের দাম্পত্যসম্পর্কের যে ক্ষতিসাধন হয়, তা অপূরণীয়।

সমরেশ বসু একজন রাজনীতি-ঘনিষ্ঠ কথাশিল্পী হিসেবেই সুপরিচিত। তাঁর গল্পে যেমন চল্লিশের দশকের অস্থির দেশকালের চিত্র বিধৃত হয়েছে, তেমনি এই উত্তাল সময়ে দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গা-দেশভাগের কবলে পড়ে অসহায় নারীদের কুলহারা হবার দৃষ্টান্তও প্রকাশ পেয়েছে। নারীজীবনের এরূপ অবমাননা বাংলা ছোটগল্পে ইতঃপূর্বে প্রদর্শিত হলেও সমরেশের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকাংশেই স্বতন্ত্র। তিনি রূপোপজীবিনীদের মর্মস্পর্শী জীবনকথনের সমান্তরালে এ-জীবনগ্রহণের অনিবার্য কারণসমূহ অনুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর গল্পের রূপোপজীবিনীরা জীবনবঞ্চনার সূত্রগুলো অনুধাবন করতে জেনেছে; তাই পতিতা-পল্লির ভয়াবহ পরিবেশেও তারা শিহরিত হয় না, বরং এটিকে জীবনের নিয়তি হিসেবে স্বীকার করে। সমকালীন গল্পকাররা যেখানে এই অন্ধকার পরিমণ্ডল থেকে রূপোপজীবিনীদের স্বাভাবিক জীবনকল্পনায় দ্বিধান্বিত ছিলেন, সেই পরিস্থিতিতে সমরেশ বসু তাদের সমাজ-সংসারে

প্রত্যাবর্তনেরও আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। সবমিলেয়ে তিনি রূপোপজীবিনীদের অপরাধী নয়, শোষিত শ্রেণির অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে গল্পে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

টীকা

১. কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে : 'পুরুষ আকর্ষণের জৌলুস তথা আকর্ষণের দক্ষতা অনুযায়ী গণিকাদের বেতন নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে গণিকাধ্যক্ষ গণিকাদের উত্তম, মধ্যম ও অধম শ্রেণিতে বিভাজিত করে যথাক্রমে ৩০০০, ২০০০, ও ১০০০ পণ বাৎসরিক বেতন প্রদান করবেন। রাজকীয় সৌকর্য উদ্ভাসিতকরণের প্রয়োজনে রূপ যৌবনের মানদণ্ডে গণিকাদের রাজার ছাতা বহনের কাজে, সোনালিপাত্র বহনের কাজে, বাতাস করার পাখা চালানোর কাজে, বসবার স্থানে পরিসেবার কাজে, পাল্কিতে আরোহণে সহায়তার কাজে এবং রথে আরোহণে সহায়তার কাজসহ অন্যান্য কাজে নিযুক্ত করতে হবে। বয়সজনিত কারণে যে গণিকার সৌভাগ্য অবলুপ্ত হবে তাকে পরবর্তী সময়ে নিয়োগপ্রাপ্ত গণিকার মাতৃরূপে নিযুক্ত করতে হবে। দীর্ঘদিন রাজার মনোরঞ্জন ও রাজসেবা প্রদানের কারণে রাজা তাকে পরিত্যাগ না করে অন্যত্র জীবিকার্জনের ব্যবস্থা করে দিবেন।' (রাজ্জাক, ২০২৩ : ১৫৬)

২ ক. '*সমাচার দর্পণে*র খবর থেকে দেখা যায়, নিকি নামে এক বিখ্যাত বাইজিকে ১৮২০-এর দশকে একজন বাবু কিনেছিলেন তখনকার এক লাখ টাকা দিয়ে। শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা থেকে জানা যায় যে, রক্ষিতাকে পাকা বাড়ি তৈরি করে দিয়ে গর্বও বোধ করতেন বাবুরা।' (গোলাম, ২০১৩ : ২০৯)

খ. উনিশ শতকের প্রথম দিকের লেখক দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় (১৮২০-১৮৮৫) [নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) পিতা] তাঁর আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন : তৎকালে 'পতিতালয় সামাজিকভাবে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান। দাদা, বাবা, ছেলে একসঙ্গে একই পতিতালয়ে যেত এবং তাদের দেখা হয়ে গেলে কোনো অপরাধবোধ হতো না, বা লজ্জা পেতো না। [...] বিদেশে [কর্মক্ষেত্রে] পরিবার সঙ্গে লইয়া যাইবার প্রথা অপ্রচলিত থাকাতে প্রায় সকল আমলা, উকিল ও মোক্তারের এক একটি উপপত্নী আবশ্যক হইত। সুতরাং তাদের বাসস্থানের সন্নিহিত স্থানে গণিকালয় সংস্থাপিত হইতে লাগিল।' (বিলকিস, ২০১৩ : ১৫৭)

৩ উনিশ শতকের বিখ্যাত অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসী একজন রক্ষিতা। তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ *আমার কথায়* গণিকাবৃত্তির নানা প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া মানদা দেবী নামে আরেকজন বারনারীর পরিচয় পাওয়া যায়, *শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত* নামে তারও একটি গ্রন্থ রয়েছে।

সহায়কপঞ্জি

অমলেন্দু সেনগুপ্ত (২০০৬)। *উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব*। প্রতিভাস, কলকাতা।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (২০১৫)। *কালের পুত্তলিকা*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী (২০১০)। *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

গোলাম মুরশিদ (২০১৩)। *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*। অবসর, ঢাকা।

দীপালি নাগ (১৪১২)। *এবং মানুষ : সমরেশ বসুর গল্প*। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

বিলকিস রহমান (২০১৩)। *উনিশ শতকে বাংলায় নারীপুরুষ সম্পর্ক*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

বিলু কবীর (২০১৩)। 'চৌদ্দ আইনে অবিদ্যাশাসন'। *ধমনি* (বেশ্যা সংখ্যা), নীলিমা, কিশোরগঞ্জ।

বুদ্ধদেব বসু (অনূ, ২০০৬)। *কালিদাসের মেঘদূত*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

মণি নাগ ও স্বাতী ভট্টাচার্য (২০২০)। *দেবদাসী থেকে যৌনকর্মী*। দীপ প্রকাশন, কলকাতা।

মনিরুল ইসলাম (২০২০)। *নারী-পুরুষ বৈষম্যের উৎস*। সংহতি, ঢাকা।

মানিক মোহাম্মদ রাজ্জাক (২০২৩)। *কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র*। নালন্দা, ঢাকা।

মাসুদ রহমান (২০১৩)। 'প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পতিতা : একটি বিক্ষিপ্ত অনুসন্ধান'। *ধমনি* (বেশ্যা সংখ্যা), নীলিমা, কিশোরগঞ্জ।

মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পাদিত) [১৪১৪]। *চর্যাগীতিকা*। স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।
মৌ ভট্টাচার্য (সম্পা, ২০১৯)। *বেশ্যাপাড়ার পাঁচটি দুর্লভ সংগ্রহ*। আনন্দ, কলকাতা।
শান্তা সরকার (১৪০৯)। *সমরেশ বসুর ছোটগল্পে সাধারণ মানুষ*। পুস্তক বিপণি, কলকাতা।
সমরেশ বসু (২০১৪)। *গল্পসমগ্র – প্রথম খণ্ড* (ড. নিতাই বসু সম্পা.)। মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা।
(২০১৫)। *গল্পসমগ্র – দ্বিতীয় খণ্ড* (ড. নিতাই বসু সম্পা.)। মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা।